এইচ.এস.সি এসাইনমেন্ট - ২০২২ইং
সপ্তাহ - ৩য়
বিষয়: পৌরনীতি ও সুশাসন, পত্র: ২য়

ক

১৯৩৫ সালের নতুন ভারত শাসন আইন প্রণয়নের প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে এর কারণ অনুধাবন করা যায়।

১। গণ আন্দোলন: ১৯১৯ সালের মন্ট-ফোর্ড সংস্কার আইন ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হলে গান্ধীজির নেতৃত্বে ব্যাপক গণ আন্দোলন শুরু হয়।

২। বিপ্লবী কার্যকলাপ: এই সময় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিপ্লবী কার্যকলাপ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ফলে সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

৩। জাতীয়তাবাদের প্রভাব: ভারতে ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রসার ব্রিটিশ সরকারকে ভাবিয়ে তোলে।

৪। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট: ১৯৩০ সালে সাইমন কমিশন ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে যে রিপোর্ট দেয় তা ভারত শাসন আইন প্রণয়নের

পথ খুলে দেয়।

৫। গোলটেবিল বৈঠক: সাইমন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে। এই আলোচনা গোলটেবিল বৈঠক নামে পরিচিত। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সাংবিধানিক সংস্কার করতে বাধ্য হয়।

৬। শ্বেতপত্র প্রকাশ: এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৩ সালে একটি 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করতে বাধ্য হয় যার ভিত্তিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন পাশ করে।

আইনের শর্তাবলী (বৈশিষ্ট্য)

এই আইনের শর্তাবলী বিশ্লেষণ করলে এর কিছু বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে।

<u>কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে:</u>

১। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন: এই আইনে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র যোগ দেওয়া ঐচ্ছিক হিসাবে গণ্য হয়।

২। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা: কেন্দ্রে ও বড় লেভেলে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নিম্নকক্ষ ফেডারেল এসেম্বলি নামে বলে এবং উচ্চকক্ষ কাউন্সিল অব স্টেট ২৬০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে বলে ঘোষিত হয়।

৩। সাম্প্রদায়িক নির্বাচন: মুসলিম ও তফসিল সদস্যদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

৪। মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্ব: গভর্নর জেনারেলের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের শাসনভার দেওয়া হয়। মন্ত্রীরা কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন বলে জানানো হয়।

৫। শাসন ক্ষমতা বিভক্তিকরণ: কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন ক্ষমতাকে সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত এই ২ভাগে ভাগ করা হয়। দেশরক্ষা, বৈদেশিক, ব্যাংক ইত্যাদি সংরক্ষিত বিষয়ে গভর্নর জেনারেলের হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়।

৬। গভর্নর জেনারেলের চূড়ান্ত ক্ষমতা: গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিচালনায় চূড়ান্ত ক্ষমতা

লাভ করেন। এছাড়া 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' ও 'স্ববিবেচনা প্রসূত ক্ষমতা' ভোগ করতেন।

৭। কেন্দ্র ও প্রদেশের ক্ষমতার তালিকা: কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের উদ্দেশ্যে ৩টি পৃথক তালিকা তৈরী করা হয়।

ক) কেন্দ্রীয় তালিকা খ) প্রাদেশিক তালিকা ও

গ) যুগ্ম তালিকা

৮। গভর্নর জেনারেলের দায়বদ্ধতা: গভর্নর জেনারেল তাঁর কাজের জন্য সরাসরি ভারত-সচিব ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন।

<u>প্রাদেশিক সরকারের ক্ষেত্রে:</u>

১। স্বায়ত্তশাসন: প্রদেশগুলিতে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২। প্রাদেশিক আইনসভা: বাংলা সহ ৬টি প্রদেশে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট এবং অবশিষ্ট ৫টি-তে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা রাখা হয়।

Scanned with CamScanner

গ। দায়বদ্ধতা: প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা তাঁদের কাজের জন্য প্রাদেশিক আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ঘ। গভর্নরের দায়িত্ব: কেন্দ্রের অনুকরণে প্রদেশের আইনশৃঙ্খলা, ধর্ম ইত্যাদির দায়িত্ব গভর্নরের হাতে দেওয়া হয়।

ঙ। গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতা: প্রদেশের গভর্নর আইন প্রনয়ন ও নাকচ করার অধিকারী হন।

চ। পৃথক নির্বাচন: কেন্দ্রের মতই মুসলিম ও তপসিল জাতিদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

খ

দ্বি-জাতি তত্ত্বের স্বরূপ:

ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে ভারতকে রাজনৈতিকভাবে দ্বিধা বিভক্ত করার নির্ণায়ক আদর্শবাদী একটি রাজনৈতিক মতবাদ। ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন

Scanned with CamScanner

২৮।০৬

অবসানের প্রাক্কালে বিশ শতকের চল্লিশের দশকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্বের ধারণার উন্মেষ ঘটান। এ তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে।

অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্ব ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের ভিত্তি তৈরি করেছিল। কংগ্রেস সভাপতি পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় উপমহাদেশে কেবল দুটি দলের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। একটি হলো কংগ্রেস এবং অপরটি হল সরকার এবং বাকী দলগুলো কংগ্রেস অন্তর্ভুক্ত। মুসলমান সম্প্রদায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানের জন্য হিন্দু নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা করেও ব্যর্থ হন। পরে জিন্নাহ উপলব্ধি করেন যে হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকলে মুসলমানের স্বার্থ রক্ষা পাবে না।

১৯৪০ সালের ২২ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে দ্বিজাতি তত্ত্বের ব্যাখ্যা তুলে ধরেন এভাবে, ভারত বর্ষে দুটি পৃথক জাতির বসবাস হিন্দু ও মুসলমান মুসলমানের কৃষ্টি স্বতন্ত্র, কালচার স্বতন্ত্র, আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বতন্ত্র, তাদের ইতিহাস ঐতিহ্য ও স্বতন্ত্র। সুতরাং জাতীয়তা যেকোনো মানদন্ডে অনুযায়ী ভারতের মুসলমানরা একটি জাতি। এভাবে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরা হয়। যার পরিণতি ঘটে ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে। পরবর্তীতে এ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

গ

লাহোর প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা:

লাহোর প্রস্তাব: ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক যে প্রস্তাব পাশ করেন সে প্রস্তাবের নাম হলো লাহোর প্রস্তাব। লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়, ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সন্নিহিত স্থানসমূহকে অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

প্রয়োজন মতো সীমা পরিবর্তন এবং যেসব স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব অঞ্চল সমূহের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এসব স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত - সার্বভৌম। ~~এ~~ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত বিভক্ত হয়ে ২টি রাষ্ট্রের রূপান্তরিত হয়।

বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি:

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে All India Muslim League-এর ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য যে অধিবেশন আহ্বান করা হয় ঐ অধিবেশনেই লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। নিচে লাহোর প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ট্য সমূহ তুলে ধরা হলো -

১। ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে এর উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলো নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে হবে।

২। উল্লেখিত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের অধীন ইউনিট বা প্রদেশগুলো স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম হবে।

৩। ভারতের অন্যান্য হিন্দু অঞ্চলগুলোর সমন্বয়ে পৃথক হিন্দু রাষ্ট্র গঠিত হবে।

৪। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ ভিত্তিতে দেশে সার্বিক অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় সংবিধানে শর্ত প্রণয়ন করা হয়।

৫। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা রাজ্যগুলোর উপর ন্যস্ত থাকবে।

তাৎপর্য :

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে অনন্য সাধারণ গুরুত্ব পালন করে। লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর মুসলিম লীগের রাজনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনের সুযোগ উপস্থিত হয়।

মুসলমানদের মধ্যে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। অপর দিকে হিন্দুরা লাহোর প্রস্তাবকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারে নি।

গান্ধীজি বলেন, লাহোর প্রস্তাব মেনে নেওয়ার অর্থ 'ভারতকে ব্যবচ্ছেদ করা' এবং তা হবে একটি পাপ কাজ।

জওহরলাল নেহেরু বলেন, লাহোর প্রস্তাব মেনে নিলে ভারত বহু খণ্ডে বর্তমান রাষ্ট্রগুলোর ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত কর্তৃত্ববাদী পুলিশী রাষ্ট্র। লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম লীগ বিরোধী পত্রিকাগুলো 'পাকিস্তান প্রস্তাব' বলে অভিহিত করে সমালোচনা শুরু করে।

তাদের অপপ্রচারেই পরে মুসলিম লীগের দল সমর্থকে পরিচিত হয়। লাহোর প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিতি অর্জন করে। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রেক্ষাপট ও বৈশিষ্ট্য:

১৯৪৭ সালের ৩ জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত স্বাধীনতা আইনের পরিকল্পনা পেশ করেন, যা ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ হয়। ভারত শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এই আইন ছিল সর্বশেষ পদক্ষেপ। নিচে ভারত স্বাধীনতা আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো দেওয়া হলো:

১। স্বাধীন পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি: এই আইনের ফলে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান

এবং ১৫ আগস্ট ভারত নামে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং তারা ডোমিনিয়ন মর্যাদা লাভ করে।

২। নতুন প্রদেশ সৃষ্টি: পূর্ব-বাংলা এবং পশ্চিম বাংলা নামে দুটি আলাদা প্রদেশের সৃষ্টি হয়।

৩। ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার: ভারত শাসন আইনের অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।

৪। গভর্নর জেনারেল নিয়োগ ও ভারত সচিবের পদ বিলুপ্তি: নবগঠিত রাষ্ট্রদ্বয়ের জন্য পৃথক গভর্নর জেনারেল হবেন রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি। এটির মাধ্যমে ভারতে সচিবের

পদ নিযুক্ত করা হয়।

ঘ। গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরের ক্ষমতা হ্রাস:
ভারত স্বাধীনতা আইনে গভর্নর জেনারেল
এবং গভর্নরের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা, বিবেক-
বুদ্ধিচালিত ক্ষমতা এবং বিশেষ দায়িত্বের
বিলোপ সাধিত হয়।
ভারত স্বাধীনতা আইনে বলা হয় গভর্নর
জেনারেল ডোমিনিয়ন মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ
অনুযায়ী কাজ করবেন।

ঙ। আইন কার্যকরী সময়: ১৯৪৮ সালের
৩১ মার্চের মধ্যে এই আইনের বিভিন্ন
ধারা কার্যকর করতে হবে।

৭। ব্রিটিশ রাজার "ভারত সম্রাট উপাধি" বিলোপ:

ভারত স্বাধীনতা আইনের অধীনে ক্ষমতা হস্তান্তরের সাথে সাথে ব্রিটিশ রাজার ভারত সম্রাট উপাধি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সুতরাং বলা যায় যে, ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ আইনের ফলেই ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।

Scanned with CamScanner